দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ইসলামের ইতিহাস আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

উম্মাহর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সময় হল বিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল, তাতারী বা ক্রুসেড নয়..... ৪

কেন মোল্লা উমর (রহ.) উসামা বিন লাদেনকে (রহ.) আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি? ১৮

ওমর রাযি. এর যামানায় শাতিমে রাসূলদের শাস্তিঃ ২১

এসো সম্ভ্রমখেকোদের গল্প শুনি... ..... ২৩

চীন থেকে আগত আল্লাহর বাহিনী!..... ২৫

মেথর শুঁকতে পারে না আতরের ঘ্রাণ!..... ২৮

উম্মাহর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সময় হল বিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল, তাতারী বা ক্রুসেড নয়

নুরুদ্দিন

Member

০৬-২৬-২০১৮

মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রায় ১৫ শত বছর আমরা পার করেছি। এত বছরের পথ চলা সহজ ছিল না। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমরা এখানে এলাম। অসংখ্য ফিতনা, বিপদ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উম্মতকে আক্রান্ত করেছে। ফিতনা, ফ্যাসাদ ও বিপদ বিপর্যয়ের ঢেউ একের পর এক এসে আমাদের পরীক্ষা নিয়েছে। এরকম একটি মহা বিপদ ছিল মঙ্গোলদের আক্রমণ। বিপদ বিভিন্ন রকমের ছিল, কখনো তা আক্রান্ত করত রাজনৈতিক ভাবে কখনো বা আদর্শিক ভাবে। আদর্শিক ভাবে মুতাজিলা, জাহমিয়া, কাদেরিয়া, খারেজিয়া, মুরজিয়া, রাফেজিয়া প্রভৃতি এবং রাজনৈতিক ভাবে বাতেনি ফাতেমিয় খিলাফত, কারামাতি, ক্রসেড ও মোঙ্গল ইত্যাদি ফিতনা আমাদের চরম ভাবে আক্রান্ত করেছিল। যদি প্রশ্ন করা হয়, এই ১৫ শত বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় কোন সময়ে হয়েছিল? কোন বিপদ উম্মাহর জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল?

স্বাভাবিক ভাবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলবেন তাতারী ফিতনাটিই সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ক্রুসেড ফিতনাকেও ভয়াবহ বলতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি বর্তমান ঐতিহাসিকদের ভাবা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর দূর ইতিহাসে না খুঁজে হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর (বিংশ শতাব্দীর) ইতিহাসে খুজতে হবে। অবশ্যই বিংশ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী সময় গুলোই হল মুসলিম উম্মাহর ১৫ শত বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময়। ইবনে কাসির, ইবনে আসির, ইবনে খালদুন, ইবনু তাবারী (রহিমাহুমুল্লাহ) ঐতিহাসিকগণ হিজরির চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস দেখেন নি, দেখলে তারা অবশ্যই এই সময়কে সবচেয়ে ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর মহাবিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করতেন। ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত হিজরি চতুর্থ শতাব্দি থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল কঠিন ভয়াবহ সময় এবং এর পরের শতাব্দীতে তাতারিদের আগমন হয়েছিল। এই

কয়েকশ বছর যত ফিতনা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন মুসলিম উম্মাহ হয়েছিল তা আর কোনো সময়ে হয় নি। এই সময়ে কারামতিদের উত্থান হয় তারা মক্কায় আক্রমণ করে হাজরে আসওয়াদ পাথর লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়, কাবার গিলাফ কেটে কেটে টুকরো করে, অসংখ্য হাজীদের হত্যা করে, এই সময়ে উম্মাহর খিলাফত কার্যত বাগদাদের শাহী মহলে সীমাবদ্ধ হয়ে পরে, মিসরে ওবায়দীয় বাতেনিদের হত্যা ও লুণ্ঠনের শাসন চলে, বুয়াইহীরা বাগদাদ দখল করে খালিফাকেও হত্যা করে, মুসলিম শাসকগণ কাফিরদের মদদ নিয়ে অন্য মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নানান ফিতনা ও বিদ'আত সমাজে সয়লাব করে, এই সময়ে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হয় এবং শাম ও মিসরের বিভিন্ন শহর তারা দখল করে, বিশেষ করে বায়তুল মাকদিস তারা দখল করে এবং হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন শহরের মসজিদ ধ্বংস করা হয়, আযানে নতুন এক লাইন যুক্ত করা হয়। ইলম ও উলামারাও এই সময়ে ফিতনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। উলামাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বাহাস লেগেই থাকত। ৭ম শতাব্দীতে তাতারিরা বাগদাদে আক্রমণ করে প্রায় ২০ লক্ষ্য মুসলিমকে হত্যা করা, পুরো খোরাসান, খাওরাজাম সাম্রাজ্য, ইরাক, ইরান, বাগদাদ, দামেস্ক, আলাপ্পো সহ বিভিন্ন বড় বড় শহর ও অঞ্চল দখল করে কোটি মুসলিমকে হত্যা করে। এই সময় মুসলিম উম্মাহকে এরকম নানান বিপর্যয় ও ফিতনা এক এক করে ঘায়েল করছিল। অবশ্যই এই বিপদ গুলো রাজনৈতিক এবং আদর্শিক উভয় ভাবে আক্রান্ত করেছিল কিন্তু এক সাথে রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভাবে উম্মাহকে পরাজিত করতে পারেনি।যখন আমরা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতাম তখন আদর্শিক শক্তি ও প্রজ্ঞা আমাদেরকে উদ্ধার করত। যখন আমরা আদর্শিক ফিতনার সম্মুখীন হতাম রাজনৈতিক শক্তি আমাদের পথ চলা সহজ করত। কখনো এগিয়ে আসতেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আমিরগণ আবার কখনো এগিয়ে আসতেন যুগের ইমামগণ। একে অপরকে পরিশুদ্ধ সংশোধন করে বাঁকা পথ থেকে সোজা পথে নিয়ে আসতেন তারা।

এই সময়ে সেলজুক শাসন তৈরি হয়। এই সময়ে নুরুদ্দিন জঙ্গি, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি জন্মেছিলেন। এই সময়ে সুলতান মাহমুদ গাজনাভি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক একটি রাজনৈতিক বিপর্যয়কে তারা এক এক জন মোকাবেলা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর অনুসারী বিশাল শ্রেণীর আলেমগন

তখনো ছিলেন। তারা আদর্শিক ভাবে উম্মাহকে বাঁকা পথ থেকে সোজা পথে নিয়ে আসতেন। সকল ধরনের ফিতনা তারা দূর করতেন। তারা বিভিন্ন শাসকদের ইসলাহ করতেন। পূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন ও বাতিলের ধ্বংস করার জন্য উজ্জীবিত করতেন।

এভাবে এক এক করে বিভিন্ন ফিতনা ধ্বংস হয়ে যায়। তারা সাধারণ মানুষের কাছে হক ও বাতিল স্পস্ট করে দিতেন। বাতিলকে স্পস্ট ভাবে গুমরাহ ও কুফুরি বলে ঘোষণা করতেন। মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। তারা আল্লাহর বিধান মানত, ফরজ পালন করত, হারাম থেকে বেঁচে থাকত। আল্লাহর দেয়া বিধানে বিচার মিমাংসা করত। বিচারের কাজ ন্যস্ত থাকত আলেমদের অধীনে। শাসকগণ শতধাবিভক্ত হলেও বিচারকের বিচারে বাঁধা দিতেন না, অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষের বিচার ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন।

ক্রুসেড যখন শুরু হল উম্মাহ জানত তাদের কি করা উচিত, যখন বায়তুল মাকদিস দখল হয়ে গেল উম্মাহ জানত কি করা উচিত, তারা তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিত সংগ্রামী লড়াইতে কিন্তু শাসকগণ প্রতারনা করে জিহাদের জন্য আদায় করা অর্থ ভোগ করত। জিহাদের আওয়াজ তুলে টালবাহানা করে দমে যেত। সাধারণ মুসলিমগণ করণীয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, ওলামারাও যথা সাধ্যে চেষ্টা করতেন শাসকদের উজ্জীবিত করার। শুধু কিছু ব্যক্তি বিশেষ শাসক ও তাদের ক্ষুদ্র অনুসারিদের জন্য বিপদের মোকাবেলা কঠিন হয়ে পরত। শাসকদের অবহেলার কারনে সাধারণ মানুষ হয়ে পরত অলস। কিন্তু সাধারণ মানুষ ছিল আগুনে নিভু নিভু ছাই এর মতন, একটু বাতাসেই জ্বলে উঠত। এভাবে তারা ক্রুসেডারদের হত্যা করল, মোঙ্গলদের পরাজিত করল। সকল বাতেনি ফিতনাকে মাটিতে দাফন করে দিল রাজনৈতিক পরাজয়।

আজ মুসলিমরা রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ পরাভূত। পুরো বিশ্বে মুসলিমের রক্ত ঝড়ছে, হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার শক্তিতো দূরের কথা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার শক্তিও নেই আমাদের। মিয়ানমার, কাশ্মির, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন সহ যেখানেই মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় তার বিরুদ্ধে কিছু মিছিল মিটিং ছাড়া শক্ত প্রতিবাদের করার মত আমাদের রাজনৈতিক কোনো শক্তি আজ বিদ্যমান নেই। এর মধ্যে কখনো কোনো তাগুতের গোলাম, ফাসিক, যালিম শাসক পরোক্ষ ভাবে প্রতিবাদ জানালে মুসলিমরা উক্ত শাসককে

সাথে সাথে খলিফা, সুলতান, আমির মনে করে মাথায় বসিয়ে নেয়।এই হল বর্তমান অবস্থা। একটি উদাহরণ দেই- 'এক মুসলিমের কাফির বন্ধু অসংখ্য মুসলিমকে হত্যা করল, কিন্তু ঐ মুসলিম চেয়ে চেয়ে দেখল। মাঝে মধ্যে দুয়েকজন মুসলিমকে ছেঁড়ে দেয়ার জন্য সে তার কাফির বন্ধুকে সম্মত করালো। এখন মুসলিমরা ঐ কাফিরের বন্ধুকে যুগের সালাহুদ্দিন আইয়ুবি উপাধিতে ভূষিত করল।' অন্ধরা জানত না সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ'র সময়েও অনেক মুসলিম শাসক কাফিরদের মদদ করত, কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহন করেছিল। কাফিরদের সাথে জোট করে মুসলিম সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কাফির ক্রুসেডাররা মুসলিমদের হত্যা করলে তারা কিছু বলত না, হ্যাঁ মাঝে মধ্যে দুয়েকজন মুসলিমকে ছেঁড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করত (এরা হল আমাদের যুগের তথাকথিত সালাহুদ্দিন)। অন্যদিকে মহান সুলতান সালাহুদ্দিন ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করার আগে এই সব মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং এদের পরাস্ত করে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর হাকিমিয়াত প্রতিষ্ঠা নেই

হিজরি চতুর্থ শতাব্দি থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসলিম ভূখণ্ড অনেক ছোট ছোট অঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও, ঐক্য নস্ট হয়ে গেলেও, খলিফার সাময়িক পতন হয়ে গেলেও, প্রায় সকল ভূখণ্ড ছিল কোনো না কোনো মুসলিম সুলতান, আমির, নবাবের নিয়ন্ত্রণে আর সেখানে ইসলামি বিধান কার্যকর ছিল। শাসকগণ ব্যক্তিবিশেষের জন্য আইনে হস্তক্ষেপ করলেও সাধারন ভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হাকিমিয়াত কায়েম ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন খলিফা ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, তখন শুধু খলিফা ব্যবস্থা ভাঙ্গে নি সাথে সাথে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হাকিমিয়াত উঠে গেল। আজ মাগরিগ থেকে মাশরিক। উত্তর থেকে দক্ষিণ। মিশর থেকে ফিলিপাইন বা ব্রাজিল থেকে জাপান, অস্ট্রেলিয়া থেকে আলস্কা কোথাও আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা নেই। আমরা কি এত টুকু বুঝি না। আমরা কি করে এই যামানাকে অতিতের ইতিহাসের সাথে মিলাচ্ছি। কি করে ভুলে গেলাম এমন পরাজয় আমাদের ইতিহাসে কখনোই হয় নি। পূর্বকার ইতিহাসবিদগণও এমন পরাজয় বা মহা বিপর্যয়ের কথা কখনো কল্পনা করেন নি।

সামরিক পরাজয়

মুসলিমরা পূর্বেও অমুসলিমদের থেকে সামরিক ফিল্ডে পিছিয়ে ছিল। অস্ত্রে, সংখ্যায়, কলাকৌশলে, অভিজ্ঞতায়, অর্থ বিনিয়োগে, সময় উপযোগিতায় কিন্তু মুসলিমরা কখনো এই পিছিয়ে পড়াকে দুর্বলতা মনে করত না। তাদের ঈমান দিপ্ত সাহস ও চেতনা, জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনোভাব অস্ত্রে ও সংখ্যায় স্বল্পতার চাহিদা পূরণ করে দিত। হিজরি চতুর্থ শতাব্দি থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসলিমরা অনেক ক্ষমতাধর ছিল। হুজুগে জাতি ছাড়া বুদ্ধিমান কোনো জাতি বা সাম্রাজ্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে বা মুসলিম ভূখণ্ডে কোনো প্রকার সামরিক আগ্রাসনের চিন্তাও করত না। তাই তো ক্রুসেডাররা মিথ্যা কিছু ধর্মীয় আবেগ তৈরি করে আর তাতারি ডাকাতদের বুদ্ধিহীনতাকে পুঁজি করে তারা মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমন চালিয়ে ত্রাস কায়েম করেছিল।

সাংস্কৃতিক পরাজয়

রাষ্ট্র বা জাতিকে অস্ত্রের বলে বেশি দিন পরাজিত করে রাখা যায় না। সামরিক পরাজয় অস্থায়ী বিজয় এনে দেয় স্থায়ী বিজয় আনতে পারে না। স্থায়ীভাবে পরাজিত শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের। সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক, রাজনৈতিক সিস্টেমের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একটি জাতিকে পরাজিত করে রাখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে পুরো বিংশ শতাব্দী পশ্চিমা সেকুলার নাস্তিক সভ্যতা মুসলিম বিশ্বকে প্রথমে সামরিক ভাবে এবং পরে সাংস্কৃতিক ভাবে আগ্রাসন চালিয়ে গ্রাস করেছে। ধ্বংস করে দিয়েছে।যে ফিলিস্তিনের জন্য আমরা কান্না করি। যে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা পশ্চিমা সাংস্কৃতির অনুসরণকারী। তারা সাংস্কৃতিক ভাবে অনেক আগেই পশ্চিমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। এই পরাজিতরা কখনোই সামরিক বিজয় পাবে না। একই অবস্থা হল প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ও জাতির।

ইসলামের উত্থানের সাথে সাথে চারটি সভ্যতার চরম ভাবে পরাজয় ঘটে-তথা রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য/পারসিয়ান সাম্রাজ্য, মিশর ও ভারতীয় সভ্যতার। ইসলামের বিস্তারে এ চারটি সভ্যতার, জাতিয়তাবাদের, সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সকল প্রথা, পদ্ধতি, অভ্যাস, কলা, সংস্কৃতির পতন ঘটে। যুগে যুগে ইসলামের উপর আঘাত আসে, কিন্তু তারা মুসলিমকে বিশ্বাস ও

সাংস্কৃতিক ভাবে পরাজিত করতে পারে নি, তাই কয়েকযুগ পরেই মুসলিমরা আবার জেগে উঠত। অবশেষে, যুদ্ধের পদ্ধতিতে পরিবর্তন হল। তারা বুঝলো, সাম্রাজ্যে বা শাসকের মহলে আঘাত নয় আঘাত দিতে হবে বিশ্বাস ও প্রথা পদ্ধতিতে। ব্রিটিশের উত্থান হল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, তারা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভূমি দখল করল। প্রায় পুরো বিশ্বের শাসক তাদের নিকট মাথানত করেছিল। কিন্তু এই সব তাদের কোনো অর্জন নয়। অর্জন হল তারা পুরো বিশ্বকে তাদের কার্বনকোপি বানিয়ে দিল, তাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, যুক্তি, শিক্ষা মুসলিমসহ সকল দেশের সভ্যতাকে পরাজিত করল। মানব ইতিহাসের সব চেয়ে বড় পরাজয় ছিল এটা। একটি ভূখণ্ড, তার অর্থ তথা স্ট্যালিং পাউন্ড, তার শিক্ষা, তার আইন, তার বিশ্বাস, তার সংস্কৃতি, তার মিডিয়া, তার ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে সকল মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করল, এবং নিয়ন্তা রাষ্ট্রের আসনে আসিন হল।

মুসলিমদের সকল স্তরে, বৃদ্ধ থেকে শিশু, পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী সবাই চাল-চলনে, কথাবার্তায়, পোশাক-আশাকে, শিক্ষা-দিক্ষায়, খাদ্যাভ্যাসে, অনুসরণ-অনুকরণে অন্ধ ভাবে পশ্চিমা সভ্যতা বা বিজাতির সংস্কৃতি পালন করছে। এমন আগ্রাসনে ভয়ানক ভাবে পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও আমার ইতিহাসের বিপর্যয় হিসেবে তাতার, ক্রুসেড খুজতেছি?

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

তখন ছিল স্বর্ণ ও রূপ্য মুদ্রা। প্রয়োজনে সোনা রূপা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হত। মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কিন্তু এই শতাব্দীতে ডলার নামক মিথ্যা কারেন্সি ব্যবস্থা চালু হয়, মুসলিমদের কাছে স্বর্ণের খনী (তেল) থাকা সত্ত্বেও তারা গরীব, তাদের মুদ্রার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমেরিকা যখন চাইবে তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যেসব মুসলিম দেশকে ধনী বলা হয়, সেসকল দেশেই সবচেয়ে নিম্ন কর্মচারী হল অন্য দেশের মুসলিমরা। এক মুসলিমের কাঁধে পা দিয়ে অন্য মুসলিম উচ্চস্থান দখল করেছে। আবার অন্যদিকে আফ্রিকায় মুসলিমরাই না খেয়ে মরছে। সামরিক ভাবে যেমন আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, জাপানের চামচামি করছি অর্থনৈতিক ভাবেও পশ্চিমা কুফফারদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। মুসলিম ইতিহাসে

কোনো কালেই এমন হয় নাই, মুসলিম ঐতিহাসিকগণকে যদি বলা হত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র কুফফারদের ছুঁড়ে ফেলা অন্ন ও অর্থের জন্য দিন রাত তাদের নিকট তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছে, তাহলে তারা বিশ্বাস করতেন না।

ইসলামিক ইলম ও আমলের বেহাল অবস্থা

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমান শুধু নাম হিসেবেই পরিগনিত হয়। ইসলামকে ব্যক্তিজীবনে আটকে রাখা হয়েছে। সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ইসলাম যে শুধু ব্যক্তি জীবনে নয় বরং সামগ্রিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য এসেছে তা আমরা ভুলে গেছি। আজকের অধিকাংশ মুসলিমরা দ্বীনের সাধারণ ও প্রাথমিক জ্ঞান রাখে না। তারা নামাজ, রোজার মত ফরজ বিধানের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কুর'আনের অর্থ জানা ও হাদিস বোঝার জন্য আমাদের কাছে সময় নেই। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কি আমরা তা জানি না। উম্মাত তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে বেখবর। ঈমান ও কুফুরের পার্থক্য নির্ণয় করতে অপারগ। তাওহিদের স্বীকৃতি দিচ্ছি কিন্তু তাওহীদের সংজ্ঞা আমাদের জানা নেই।

সুদ, ঘুষ, যিনাহ ব্যাভিচার, অশ্লীলতা, নাচ গান-মিউজিক, গেমস, কুফর, শিরক সহ বিভিন্ন বদআমলীতে ডুবে আছে অধিকাংশ মুসলিম সমাজ। যুবকরা নারী ও নেশায় মাতাল হয়ে আছে।

পূর্বে আরবী ভাষায় দক্ষ ও কুর'আন হাদিসের শিক্ষায় শিক্ষিতকে মুসলিম সমাজ জ্ঞানী বলে মনে করা হত, এবং আজকে আরবী ভাষা নয় কুর'আন হাদিস নয়, এমনকি এই সব জানা শাইখরাও ইংলিশ না জানলে তাকে মুসলিম সমাজ মূর্খ মনে করে। যাইহোক, আমাদের মূর্খতা কতটুকু সেটা পরিমাপ করার মত ইলমও আমাদের নেই। ফুটবল খেলার আগে সুরাহ ফাতিহা পাঠ ও দুয়া হচ্ছে, গোল দেয়ার পরে সিজদাহ হচ্ছে। ইং সা আল্লাহ বলে হারাম ফিল্ম রিলিজ হচ্ছে। এই হল আমাদের ইলমের হাল। আমার ওয়ালে অনেক পোস্ট আছে। এই বিষয়ে লিখতে গেলেও হাত থেমে যায় ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। এখন লিখতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

ইসলামের অসংখ্য পরিভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে।দার, দারুল হারাব, দারুল ইসলাম, তাকফির, খারাজ, জিজিয়া, গনিমত, হিজরত, খিলাফা,

খলিফা, আমির, জিহাদ, ফি সাবিলিল্লাহ ইত্যাদি শব্দ গুলো আজ যাদুঘরে চলে গেছে। আজকের মুসলিমদের সাথে এই সকল শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু শব্দ এখনো থাকলেও পারিভাষিক অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এবং মুসলিম মননে অদ্ভুত সব আভিধানিক অর্থ স্থান করে নিয়েছে। অথচ পূর্বে মুসলিমরা এগুলোর প্রকৃত অর্থ জানত। তারা জানত তারা কোথায় আছে দারুল কুফরে না ইসলামে, তারা জানত তাদের হিজরত করতে হবে কি না, তারা জানত গনিমত কি, তারা জানত ফি সাবিলিল্লাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ , তারা জানত খলিফা না থাকলে কি হবে, তারা জানত কিভাবে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারা জানত কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হয়ে যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদ

ইসলামিক জাতীয়তাবাদ ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয়তাবাদের ব্যানারে মুসলিম ভাগ হলে মুসলিমরা চরম ভাবে বিপর্যয়ের শিকার হত। পূর্বে মুহাজির-আনসার। বনু খাজরাজ-বনু আউস। আব্বাসি-উমাইয়াহ। আরবী-আজমী। শামী-ইয়ামানী। এসবে কিছুটা জাতিয়তাবাদের উত্থান দেখা যেত। আন্দালুসিয়ায় সুন্দর গোছানো মুসলিম রাজত্ব একাধিকবার তছনছ হয়েছিলে এই গোত্রবাদ ও গোত্রপ্রীতির কারণে। খিলাফত বনু উমাইইয়া ও আব্বাসীর দণ্ডেও অনেক রক্ত ঝড়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন ছোট ছোট গোত্রের মাঝে লড়াই হত এমন হাজারো ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গোত্রপ্রীতির রাজনীতি শুধু শাসকের আসন দখলকে কেন্দ্র করেই ঘটত, ব্যক্তি জীবনে কোনো প্রকারের প্রভাব বিস্তার করত না। সাধারণ মানুষ ছিল এসব থেকে বহু দূরে। আচার-আচরনে চিন্তা চেতনায় প্রভাব পড়ত না। গোত্রপ্রীতি বা জাতির চেতনা শত্রু মিত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ হত না। মুসলিম মুসলিম মাত্রই ভাই ভাই সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু বর্তমানে। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের কালগ্রাস কতটা গভিরে আছর করেছে তা বুঝতে হলে আল্লামা ইকবালের ওয়াতিনিয়াত কবিতাটিই যথেষ্ট। তিনি রাষ্ট্র তথা দেশ তথা জাতীয়তাবাদকে নব্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দুরা তাদের উপাস্যের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোক পাঠ করে, তাই তারা মুশরিক। মুশরিকদের মত করে, ওয়াতানিয়াত নামক নতুন খোদার সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াতিনিয়াতের পূজারীরা ওয়াতানিয়াত কর্তৃক নির্ধারিত শ্লোক পাঠ করছে।

পতকাকে বানিয়েছে দেবতা, জাতীয় সঙ্গীতকে হল ধর্মীয় শ্লোক। খালি পায়ে পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করে পুরো ব্যবস্থাকে করেছে হিন্দুর পূজামণ্ডপ। তিনি উদ্বুদ্ধ করে বলছেন- হে মুসলিম ভেঙ্গে ফেল এই নতুন উপাস্যকে। তিনি কবিতায় বলতে চেয়েছেন-"যুগ বদলেছে বদলেছে যুগের মানুষ। মুসলিমরা আলাদা কাবা গড়েছে। নয়া যুগের আযররা (ইব্রাহীম (আ) এর পিতা'র অনুসারীরা) নতুন খোদা বানিয়েছে। নতুন এই খোদা গুলোর মধ্যে দেশ অর্থাৎ রাষ্ট্র হল বর্তমানে সব চেয়ে বড় খোদা। এই খোদার সমাজে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আধুনিক সভ্যতার এই নতুন খোদা ইসলামের কাঠামোকে চুরি করেই গড়া হয়েছে। কেননা ইসলাম শুধু একটি মাজহাব (ধর্মীয় বিধি নিষেধ) নয়। ইসলাম হল একটি দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। জাতীয়তাবাদের এই ধারনা ইসলামের ভিতর থেকে চুরি করে পশ্চিমারা আবিষ্কার করেছে এবং ধর্মকে বাহিরে রেখে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম (অর্থাৎ রাষ্ট্র) তৈরি করেছে। মুসলিমরা সীমানা বা পতাকার মাঝে একত্র হয় না বরং কালেমার পতাকার নিচে ঐক্য হয়। ইসলাম হল মুসলিমের দেশ, কেননা তারা রাসুল (সা) এর অনুসারী। বাতিল সকল খোদাকে উপড়ে ফেলাতে মুসলিমরা অভ্যস্ত। তাই মুসলিমদের উচিত এই বাতিল ধ্বংস করে ফেলা।" কাওমিয়াত কবিতায় তিনি আরো বুঝিয়েছেন-

"রাষ্ট্র, বিভিন্ন দেশ, সীমানা মানুষকে বিভক্ত করে ফেলেছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে পৃথক দেশ নামে বিভক্ত করে ফেলেছে। মুসলিম ভূমি বিধর্মীদের দ্বারা দখল হলে এক সময় দেখা যেত মুসলিমরা আবার জেগে উঠত, আর পুনরায় দখল করত। তাই ইসলামের শত্রুরা বুঝতে পারলো, মুসলিমদের উপর স্থায়ী ভাবে শাসন করার দুটি পথ রয়েছে। এক, দখলকৃত অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মুসলিমকে হত্যা করতে হবে বা নির্বাসন করতে হবে (যেমনটা আন্দালুসিয়ায় হয়েছিল), দ্বিতীয় পদ্ধতি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদে বিভক্ত করে ফেলা। তাই তিনি বললেন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোঁড়াকেই কেটে ফেলেছে এটা।" জাতীয়তাবাদী আজকের মুসলিমদের তিনি প্রশ্ন করছেন- তুমি নিজের পরিচয় দাও তুমি সাইয়্যাদ, তুমি মীর্জা, তুমি আফগান- সব কিছুই তো আছ তুমি, বল আছো কি তুমি মুসলিম?

'জাতীয়তাবাদ' কতটুকু পার্থক্য করে তা আমরা আসলে বুঝি না। একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে ইং সা আল্লাহ। ধরুন ভারত দিনাজপুর অঞ্চলে আক্রমন করে

অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। তখন আমরা বলব, 'আমাদের দেশে' আক্রমণ করা হয়েছে। ধরুন ইজরাইল ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। তখন আমরা বলব 'ফিলিস্তিনে' আক্রমণ করা হয়েছে। এখানে পার্থক্য শুধু 'আমাদের' শব্দে নয় বরং আমাদের মনের আবেগে বিশ্বাসে। যদি বলা হত দিনাজপুরের মুসলিমের উপর আক্রমণ হয়েছে, এবং ফিলিস্তিনের মুসলিমের উপর আক্রমণ হয়েছে। তখন মুসলিম জাতীয়তাবাদ উঠে আসত এবং আমাদের (দিনাজপুর ও ফিলিস্তিনবাসী উভয়ের প্রতি) আবেগে কোনো তফাত থাকত না, পুরো দুনিয়ার মুসলিমের জন্যই আমাদের আবেগ অভিন্ন হত। কিন্তু যদি রাষ্ট্রে ভাগ করে ফেলা হয় তবে আপন রাষ্ট্রের প্রতি আবেগ আসবে পর রাষ্ট্রের প্রতি আবেগ আসবে না। এটাই হল জাহিলিয়াতের জাতীয়তাবাদ। মুসলিম জাতীয়তাবাদ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশ কেন্দ্রিক নয় বরং তা পুরো বিশ্ব কেন্দ্রিক। তাই কবি ইকবাল বলেন,

"চীন ও আরাব হামারা হিন্দুস্তা হামারা মুসলিম হ্যাঁয় হাম ওয়াতান হ্যাঁয় সারা জাহা হামারা"। জাতীয়তাবাদ আজ আমাদের গ্রাস করেছে। একটি শিশুও আজ শত্রু-মিত্র বাছাই করছে জাতীয়তাবাদের আয়ানায়। এটা একটি জাহিলিয়াত চেতনা। ইতিহাসে এমন অবস্থা ভাবাও কঠিন ছিল।

বুদ্ধি ও চিন্তাভিত্তিক দৈনতা

এটা যেন এমন হল মুত'আ যুদ্ধে মুসলিমরা দেখল সারি সারি অসংখ্য রোমান সেনা উন্নত অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অশ্বারোহী বর্ম পরিধান করে আছে, তাদের সকলের পুরো দেহ বর্মে ঢাকা, মাথায় রয়েছে হ্যাট, খুরধার চকচকে তালোয়ার, রয়েছে অসংখ্য ঘোড়া, উন্নত উট ও উটের জিন। তাদের কাছে পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার আছে, আছে সুন্দর পোশাক। তাদের আমিরের তাবু দেখতে বিশাল অট্টলিকার মতন। এই সব দেখে মুসলিমরা বলছে আমরা কি করে তাদের সাথে পারব? তারাই তো বিশ্ব শাসন করবে আমরা হব পরাভূত। তারা প্রযুক্তি, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুতে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে তাই আমাদের উচিত আমাদের অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি উন্নত করা তাহলে আমরা অবশ্যই বিশ্ব শাসন করতে পারব। আমরা অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজে যাব তাদের থেকে শিক্ষা নিব, আমাদের সামাজিক কালচার তাদের মত গড়ব

তাদের মত সভ্য হব এভাবে একদিন নিশ্চয় আমরা তাদেরকে পরাস্ত করতে পারব।

দুঃখজনক হলেও সাহাবাগন এমন ভাবেন নি তারা কখনো বিপদে পড়লে কুর'আন ও সুন্নাহর সাহায্যে উপায় খুজতেন। কিন্তু আজ আমাদের তথাকথিত অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদগণ কুর'আন সুন্নাহ ভুলে ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ডের মাধ্যমে উপায় খুজেন। তারা বলেন আমরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সামাজিকতায়, অর্থনীতিতে পশ্চিমাদের থেকে পিছিয়ে আছি তাই আমরা আমাদের অবস্থান হাড়িয়েছি। তারা এটা বুঝে না আমরা কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে দূরে যাওয়ার ফলেই আজ আমাদের এই দশা। তারা বলে আমাদেরকে উন্নত হতে হবে, তাদের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে ব্যাংক হয়েছে তো এর বিরোধিতা না করে ইসলামিক ব্যাংক বানাতে হবে। গণতন্ত্রের বিপরিতে ইসলামিক গণতন্ত্র। বামীর স্থলে ইসলামিক বামী, হারাম মদের স্থলে হালাল মদ। আমাদের নারীরাও পিছিয়ে নেই তাই সবাইকে ঘর থেকে বের করে অফিসে নিতে হবে। দাঁড়ি অসভ্যের প্রতিক তাই সভ্য হওয়ার জন্য দাঁড়িকে ছোট করলে প্রবলেম নেই। ইসলাম বেশ স্ট্রিক্ট তাই একে শান্তি শান্তি শান্তি বলে প্রচার করতে হবে। সভ্য হতে হলে ইংলিশ শিখতে হবে, পূর্বের মুসলিমগণ মাতৃভাষা বাদে এরাবিক শিখতেন আর এখন আমরা ইংলিশ শিখি। আর অবাক করা বিষয় হল, মুসলিমরাই ইংলিশ শিখতে সবচেয়ে বেশি তৎপর অন্য দেশ বা জাতি গুলো যেমন চাইনিজ, জাপানিজ, স্প্যানিশ, ড্যানিস, জার্মান, রাশান ইত্যাদি ইংলিশ শিখতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। কনসারভেটিজম বা মডারনিজম আগে ছিল না। কোনো এমন শাইখ ছিল না যারা ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের সহাবস্থান মেনে নিতেন। ইসলামকে কাটছাঁট করার প্রজন্ম কোনো কালেই ছিল না।মডারেট শ্রেণীর মেজরিটি মুসলিম শিরকি নিজামকেই খিলাফাত মনে করে। ভোট পেয়ে জয়ী হওয়া, সেকুলারের শপথ গ্রহণকারীদের নব্য খলিফা মনে করে। এদের খলিফা হল ব্যক্তিজীবনে ধর্ম মাননে ওয়ালা মুসলিম। রাষ্ট্রসহ সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বাস্তবায়ন বিষয়ে তারা কিছু জানে না। এরা ফুটবল খেলায় গোল দিয়ে সিজদা করা মুসলিমদের দেখে ভাবে ইসলাম জিন্দা হচ্ছে। কাকে কি স্থান দেয়া হচ্ছে খবর নেই। এরা ক্ষমতাই আসা মানে শুধু এটাই হল যে তাদের স্থলে আরো খারাপ, আরো মন্দ আরো সেকুলার, আরো মডারনিস্ট, আরো আমেরিকা-ন্যাটো-রাশিয়ার পা চাটা গোলামরা আসে নাই।

উল্লেখ্য এখানে তাদের মধ্যে পার্থক্য হল শুধু 'আরো' শব্দটি। গনতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যদিও সেকুলার ইসলামের সাথে কাটছাঁট করে ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া বানিয়েছে। আরও বানিয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান। এটা হল চরম পর্যায়ে বুদ্ধিভিত্তিক পরাজয়। আল্লাহ পানাহ।

একাল ও সেকাল

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে মুসলিমরা এক বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তখন উম্মাহর এমন এক জামায়াত দুনিয়াতে অবস্থান করছিল, যারা যে কোনো বিপদ ও ফিতনাকে কেটে ফেলতে পারতেন। তাদের এক এক জনকে আল্লাহ এতটা মজবুত ঈমান দিয়েছিলেন যে, ঈমানের নূর হয়ে পুরো দুনিয়াকে আলোকিত করার জন্য তারা যথেষ্ট ছিলেন। এর পরের জামায়াত ছিল তাবেই ও তাবে তাবেঈ'র। এই সময়ের কারবালা ও হাররার ঘটনা ঘটে। হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কতল করা হয়। পরের বছরে মদিনায় লুটপাত, ১০ হাজার মুসলিমকে হত্যা ও হাজারো মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল। এর পরে ইয়াজিদের মৃত্যু হল। মৃত্যুর খবর পেয়ে- আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযিদের সৈন্যদের বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 'তাগূত'-কে ধ্বংস করে দিয়েছেন।" ইয়াজিদের প্রতি সাহাবী তাগূত শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যদি আজকের যুগে তারা থাকতেন তাহলে দেখতেন মুসলিম নামধারী অসংখ্য প্রকৃত 'তাগূত' শাসকের আসনে আসিন রয়েছে। এরপর এল ক্রুসেড ও তাতারি ফিতনা তারা কোটি মুসলিমকে হত্যা করেছিল, সাময়িক ভাবে মুসলিমরা হতাশ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম হত্যা করে মুসলিমের পরাজয় কখনো হয় নি, বরং মুসলিমের মধ্যে আদর্শিক ভাবে মিথ্যা বিশ্বাস ও চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেই তারা পরাজিত হয়। তখন যদি ২০ লক্ষ নিহত হয়ে থাকে, তাহলে বিংশ শতাব্দীতেও কোটি কোটি মুসলিম নিহত হয়েছে। সে কালে খোরাসান, সেন্ট্রাল এশিয়া, শাম, ইরান, মুসলিমদের বেদখল হয়েছিল, আন্দুলুসিয়া মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছিল। আর বিংশ শতাব্দীতে পুরো দুনিয়ার সকল মুসলিম ভূখণ্ড, সকল শহর মুসলিমদের হাতাছাড়া হল। কোলোনিয়াল পুতুল সরকার দিয়ে যুগ যুগ ধরে কাফিরা মুসলিমদের শাসন করতে লাগল। কোনটা বড়

পরাজয়'? কি করে আমরা বর্তমানকে পূর্বের তাতারী, ক্রুসেড, আন্দুলুসিয়া, মুরতাদি, বা কারবালা ও হাররার ঘটনার সাথে মিলাতে পারি'?

পরিশেষে.....

এ হল বর্তমান মুসলিম উম্মাহর হাল। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক সহ সকল ক্ষেত্রে আজ মুসলিম উম্মাহ চরম ভাবে পরাজিত, মহাসংকটে, মহা বিপর্যস্ত। কিন্তু আমরা যখন তথাকথিত মুসলিম ও তাদের শুয়ুখদের দিকে তাকাই, তাদের শাসকদের দিকে তাকাই তখন দেখি তারা বেশ আরামে আছেন। তারা উম্মাহর করুণ বাস্তবতা সম্পর্কে বেখবর। এযুগের বাস্তবতা তারা দেখতে পায় না, তারা আত্মিক অন্ধত্বের শিকার। অবশ্যই উম্মাহর পূর্বের বিভিন্ন বিপদ ও সংকট নিয়ে তারা চিন্তা করে, তাহকিক করে, যেমন তাতার ও ক্রুসেডার নিয়ে তাদের গবেষণার অন্ত নেই। ইঞ্জেকশন দিয়ে ফুলানো মোটা গরুর অবস্থা আর এসি রুমে বসা মডারেট শাইখের মুখে বর্তমান মুসলিমদের হাল জানা আমার কাছে একই মনে হয়। তারা এক মিথ্যা ইসলাম ও মিথ্যা মুসলিমের অবস্থা গিলাচ্ছে, বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে যারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝেন তারা তা স্বীকার করতে অপারগ। কি করে আমরা বর্তমান বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহর অবস্থাকে নজর আন্দাজ করতে পারি'? কেন আমরা তাতার ক্রুসেড সংকট নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের পথ নিয়ে চিন্তা করছি না'? কেন উম্মাহর বেহাল অবস্থার কথা বললে আমাদেরকে অতিতের বিপদ দেখিয়ে বলা হয় এর চেয়ে বড় বড় বিপদ এসেছিল'? কেন বলা হয় এখন দুনিয়ার অবস্থা খুব স্বাভাবিক'?

এই যামানার উদাহরণ অন্য যামানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই যামানাকে নতুন করে চিনতে হবে, কুর'আনে হাদিসের আলোকে চিনতে হবে, ইতিহাসের পাতায় নয়। চোখ থাকতেও আমরা অন্ধত্বের শিকার হয়েছি। যদি বাস্তবতাকে সঠিক ভাবে না বুঝতে পারি তাহলে কি করে করণীয় নির্ধারণ করব। আমরা সমস্যাকে সমস্যাই মনে করছি না, বিপদকে বিপদ মনে করছি না। যেন জেলের কয়েদী ভুলে গেছে সে একজন কয়েদী, যেন একজন দাস ভাবছে সে স্বাধীন। দাজ্জালী চক্রান্ত এমন ব্রেইন ওয়াস করিয়েছে যে নিজের সঠিক অবস্থানও সনাক্ত করতে পারছে না। অন্ধকার

গহ্বরের তলানিতে নিপতিত হয়েও ভাবছে পাহাড়ের চূড়ায় তার অবস্থান। এ যেন দাজ্জালী সভ্যতার নিকট ইসলামি সভ্যতার এক মহাপরাজয়!!

اللَهُمَّ أَرِنَا الاَشْيَاءَ كَمَا هِي

''হে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেক জিনিসের আসল রূপ দেখাও যাতে বাহিরটা দেখে প্রতারিত না হই''

اللهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقّاً وَارْزُقْنَا التِبَاعَةَ وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

"হে আল্লাহ, আমাকে সত্যকে সত্য বুঝার, ও এর ওপর আমল করার তৌফিক দাও এবং মন্দ ও খারাপকে খারাপ করে দেখাও, এর থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও।"

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০০৮৫

কেন মোল্লা উমর (রহ.) উসামা বিন লাদেনকে (রহ.) আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি?

আবু আহমাদ হিন্দী
Member

০৮-২৯-২০১৮

অনেকেই বলেন যে, বিন লাদিন এবং তার সাথীদের আমরিকার হাতে তুলে দিলে কি এমন ক্ষতি হত? আল-ক্বায়িদাই তো বলে যে ব্যক্তির চেয়ে দলের স্বার্থ আগে, দলের চেয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থ আগে। তাহলে আল-ক্বায়িদা কেন নিজেদের স্যেক্রিফাইস করলো না, আর মোল্লা উমার-ই বা কেন তাদের আমরিকার হাতে তুলে না দিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করে মুসলিমদের হত্যা-নির্যাতন করার এত বড় সুযোগ আমরিকাকে দিলেন?

প্রথমত আপনাদের নিজেদের প্রশ্নের সাথে নিজেদের সৎ হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আপনি যা বুঝেন শরীয়াত-ও তাই বুঝে কিনা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ! আমরিকার হাতে আল-ক্বায়িদাকে তুলে দিলে আফগানের ইসলামী রাষ্ট্র টিকে যেত, এবং এরপরও সেটা স্বাধীন এবং ইসলামী ইমারাত থাকত -এরকম নিশ্চয়তা দেয়ার মত কি কেউ ছিল? না, কেউই ছিল না। কারণ এর চেয়েও লেইম লেইম এক্সকিউসে মার্কিনরা আরো অনেক দেশে হামলা করেছে, এবং এর জন্য তাদের তেমন কোন জবাবদিহীতা করতে হয় নি। এবং শুধু কি আল-ক্বায়িদাকে ধরিয়ে দেয়ার দাবীই ছিল? তালিবানদের শাসন, শরীয়াহ আইনের ব্যাপারেও তো তাদের আপত্তি ছিল। তো এজন্য কি শরীয়াহ আইন স্থাগিত করা উচিত ছিল? তালিবানদের ক্ষমতা শুধু আমরিকার কথায় ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল? নিজেদের সাথে সততা রেখে প্রশ্ন করুন।

মোল্লা উমার কেন আল-ক্বায়িদাকে আমরিকার হাতে তুলে দেয় নি, এর পিছনে কারণগুলো তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। পাকিস্তান থেকে বড় বড় 'আলিমরা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে বৃহত্তর স্বার্থে যেন বিন লাদিনকে আমরিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, আগামীকাল আমাকে চাইলে কি, আমাকেও তুলে দিবেন? এটাই তো হল মূল কথা! এটাই হল বাকি সকল

ইসলামপন্থী এবং 'উলামা সমাজ থেকে তাদের পার্থক্য! তারা একসাথে সীসাঢালা প্রচীর হয়ে ফাইট দিয়ে মরতে চায়। আর বাকিরা বলে একজনকে ধরিয়ে দিলে তো আমরা বাঁচলাম, দে ধরাইয়া। পরের দিন কুফফারেরা আরেকজনকে চায়, পরের দিন আরেকজনকে! এভাবেই চলতে থাকে, চলে আসছে। আর কত নিজেদের আরামের জন্য নিজের ভাইদের ধরিয়ে দিবো? কালকে হয় আপনাকেও ধরিয়ে দেয়া হবে, অথবা আপনি নিজেই তাদের একজনে পরিণত হবেন, যাদের কাছে ধরিয়ে দেয়া হয়।

বাকিরা বিন লাদিনকে ছেড়ে দিয়েছিল। মোল্লা উমার ছাড়েন নি। তারা তাই মোল্লা উমারকেও ছেড়ে দিল। আমরিকাকে জল দিল, আকাশ দিল, ভূমি দিল এনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য। এগুলো ব্যবহার করে আমরিকা শতশত মানুষ মারল, ইসলামী ইমারাহ ধ্বংস করলো। এরপর যারা কিনা জল, স্থল, গগণ দিল, তারাই সকল দায়ভার বিন লাদিন আর মোল্লা উমারের উপর চাপালো। তারা আমরিকার বিরুদ্ধে না গেলে আমরিকা এমন করত না। তাহলে আপনারা কি করলেন, আপনারা কেন আমরিকাকে না থামিয়ে সুযোগ করে দিলেন? তখন তারা বলবে, সেটাও বিন লাদিন আর মোল্লা উমারের দোষ। কারণ তারা এমনটা না করলে আমরিকা 'তাদের' ব্ল্যাকমেইল করতে পারত না। তাই ব্ল্যাক মেইল করার আগেই আমরিকার পায়ে মাথা ঠুকিয়ে রাখাই কাম্য। এটা নাকি লোক দেখানো মাথা ঠেকানো। মনে মনে তো আমরা আল্লাহকেই মানছি। এজন্যই তো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সকল কিছু ইসলাম সম্মত হয়ে যাচ্ছে কতক উজবুকের কাছে।

যখন মক্কার মুশরিকরা মদীনার মুনাফিক আর ইহুদীদের সাথে মিলে মদীনা আক্রমণ করে মুসলিমদের কচুকাটা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন মুসলিমদের উপর যে বিধান ছিল, আফগানে আমরিকার আক্রমণের ক্ষেত্রেও একই বিধান। বলবেন যে মুসলিমরাই তো আগে ৯/১১ করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। আরে ভাই বদর যুদ্ধের আগেও মুসলিমরাই এরকম বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তখনকার নিষিদ্ধ মাসে তাও আবার কালিমা বলার পরও মুশরিকদের বাণিজ্য কাফিলার একজনকে হত্যা করেছিল, তো এর জন্য কি বদর যুদ্ধ করা ইনভ্যালিড ছিল? এরজন্য কি ওই সাহাবীকে মুশরিকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল? আমরিকার সাথে কি মোল্লা

উমারের এমন কোন চুক্তি ছিল যে, আমরিকার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে মোল্লা উমার তাকে আমরিকার হাতে তুলে দিবেন? না ছিল না! তাহলে কোন উসূলে আমরিকার মত প্রতারক রাষ্ট্রের হাতে কিছু মুসলিমদের তুলে দিলেই এই আশা করা যায় যে, আমরিকা চিরতরে ইসলামী ইমারাতের বিরুদ্ধে তাদের সকল অভিযোগ, ষড়যন্ত্র বন্ধ করে দিত, আর কখনো হামলা করত না?!

আফগানের আগে বিন লাদিন সুদানে ছিলেন। তখনও তো ৯/১১ হয় নি। তখন কেন সুদানকে হুমকি-ধামকি দেয়া হত? এবং কেন সুদানকে বাধ্য করা হয় বিন লাদিনকে বের করে দেয়ার জন্য? তো সুদান তো বের করে দিয়েছিল! এরপরও কি সুদান টিকতে পেরেছে? কোন খোঁজ রেখেছেন সুদানের? শুনুন আমি বলছি সুদানের কথা। দুই টুকরো করা হয়েছে সুদানকে। মরুভূমির অঞ্চলটা মুসলিমদের আর খনিজ সম্পদের ভরপুর অঞ্চলটা খ্রিষ্টানদের দেয়া হয়েছে। আরো মজার কথা কি জানেন? আমরিকান বুট ছাড়াই, বাংলাদেশ-পাকিস্তান থেকে ভাড়া করা মুসলিম নামওয়ালা শান্তিরক্ষী বাহিনীকে গ্রাউন্ডে রেখে তাদের সাহায্যে সুদান থেকে খ্রিষ্টানদের জন্য দক্ষিণ সুদান স্বাধীন করা হয়েছে, কি কিউট না?

তো এর জন্য সুদানের প্রশাসনের কোন প্রশংসা করেন না কেন? মোল্লা উমার আমরিকার কথা না শুনে ব্যাকডেটেড হলেন, আপনাদের দুয়ো শুনলেন, অথচ সুদানের প্রশাসন তো আমরিকার কথা শুনেছিল! আপনারা দেখি তাদের প্রশংসা করছেন না! আর সুদানকে দুই টুকরো করা হল, আপনাদের অনুভূতি কি? সুদানের শাসক কি জাতিসঙ্ঘ, আর আমরিকার আইন মানতে বাধ্য? হ্যাঁ বাধ্যই তো! ব্ল্যাক মেইলড হওয়ার আগেই তো আপনারা সিজদা দিয়ে দেয়ার মানহাজে বিশ্বাস করেন। ঠিক এভাবে পশ্চিমা কুফফাররা খারাপ বলবে দেখে শরীয়াহ আইনের কথা সরাসরি বলেন না। বলেন ইসলামী গণতন্ত্রের কথা, ইসলামী ধর্মনিরপেক্ষতার কথা! নাকি এখন আর তা পশ্চিমাদের দেখানোর জন্য রয় নি? দীর্ঘদিন এই মিথ্যার সাথে থাকতে থাকতে একেই সত্য ধরে নেয়া হয়েছে? যেভাবে মাজার পূজারীরা মাজার পূজার সাথে থাকতে মাজার পূজাকেই ইসলাম মনে করে থাকে!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৫৩৯

ওমর রাযি. এর যামানায় শাতিমে রাসূলদের শাস্তিঃ

Ahlos sogor
Senior Member

০৫-২৪-২০১৮

ইমাম জারুল্লাহ যামাখশারী বলেন, বাহরাইন নামক অঞ্চলের কতগুলো শিশু 'সাওলাজ' আর বল নিয়ে হৈ হুলোড় করে খেলা করছিলো। 'সাওলাজ' হলো অগ্রভাগ বাঁকানো লাঠি। যাকে 'হকি স্টিক' বলা চলে।
খেলার একপর্যায়ে তাদের বল গিয়ে পড়লো একজন খৃষ্টান পাদ্রীর গায়ে। পাদ্রী বলটি সামলে নিলো। শিশুরা অনুনয় বিনয় করতে লাগলো বলটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু পাদ্রী বলটি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালো। সর্বশেষ উপায় হিসেবে একটি শিশু কাতরকণ্ঠে বললো, আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওসীলা নিয়ে বলছি, বলটি ফিরিয়ে দিন। কিন্তু পাদ্রী অনঢ়; সে বল ফিরিয়ে দিতে কিছুতেই সম্মত নয়! উল্টো সে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম মোবারক শুনতেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলো!

এবার শিশুরা চটে গেলো! তাদের মাথায় খুন চেপে বসলো! ক্ষুধার্ত ব্যঘ্রের ন্যায় তারা পাদ্রীর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। হাতের হকিস্টিক দিয়ে তারা খুঁচিয়ে খুচিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে পাদ্রীর ভবলীলা সাঙ্গ করে ছাড়লো!

ঘঠনাটি ছিলো খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.- এর খিলাফতকালের। ঘঠনাটির খবর যখন তাঁর দরবারে গিয়ে পৌঁছলো, আল্লাহর কসম! তিনি এতোটাই আনন্দিত হলেন যে, কখনও এতোটা আনন্দিত হননি কোনো অভিযানে বিজয় বা গানিমাহ অর্জনের পর! তিনি আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, এখন ইসলাম সম্মানী হলো! ইসলামের স্বকীয়তা বজায় রইলো!

সুবহানাল্লাহ! রাসুলপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো শিশুগুলো! কেমন ছিলো ঐ কচিকাঁচাগুলোর আত্নসম্ভ্রমবোধ! শাতিমে রাসুলের ইহলীলা সাঙ্গ করেই তবে ক্ষান্ত হলো! সালাম জানাই ঐ কচিদের! হাজার সালাম!

সূত্র-

ইমাম জারুল্লাহ যামাখশারী রচিত 'রাবী'উল আবরার' নামক গ্রন্থ।

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-২৭-২০১৮

মূল আরবিটা এমন:

خرج غلمان من أهل البحرين يعلبون بالصوالجة ، وأسقف البحرين قاعد، فصكت الكرة صدره فأخذها، فجعلوا يطلبون إليه في ردها، فأبى، فقال غلام منهم: أسألك بحق محمد لما رددتها علينا، فشتم رسول الله، فاقبلوا عليه بصوالجهم وما زالوا يخبطونه حتى مات.

فرفع ذلك إلى عمر ﷺ، فو الله ما فرح بفتح ولا غنيمة من غنائم المسلمين كفرحه بقتل أولئك الغلمان الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام، إن غلمة صغارا سمعوا شتم نبيهم فغضبوا له و انتصروا. ثم أهدر دم الأسقف

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: 5\ 30

মনে হচ্ছে, পাদ্রিটা একটা সাধারণ পাদ্রিই ছিল না, বরং বাহরাইনের প্রধান পাদ্রি ছিল।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৮৭৯-

এসো সম্ভ্রমখেকোদের গল্প শুনি...

sifat

Member

০৯-০৮-২০১৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর, শুধুমাত্র আমেরিকান সেনারা প্রায় একলাখ নব্বই হাজার জার্মানি নারী, যুবতী ও মেয়েশিশুর সম্ভ্রমহানি করেছে! তাদের মিত্রশক্তি ব্রিটিশ সেনারা পঁয়তাল্লিশ হাজার জার্মানি যুবতীকে ধর্ষণ করেছে! তদ্রুপ আরেক মিত্রশক্তি ফরাসি সেনারা পঞ্চাশ হাজার জার্মানি যুবতীর ইজ্জতহানি করেছে! শুধু তাই নয়; আমেরিকান সেনারা তিনহাজার পাঁচশ ফরাসি যুবতীর ইজ্জত হরণ করেছে। অথচ ফ্রান্স ছিল তাদের মিত্রশক্তি! আবার রাশিয়া প্রায় একমিলিয়ন নারীর শ্লীলতাহানি করে! এদের অনেককেই তাদের মা-বাবার সামনেই বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করা হয়েছে! অনেকেরই অনাবৃত লাশ রাস্তার উপর পড়ে রয়! অনেককেই ধর্ষণে বাঁধা দেয়ার কারণে গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয়!

আমেরিকান সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে এই আইন জারি করা হয়েছিল যে, জার্মানির প্রত্যেক বাসিন্দা যেন নিজ নিজ ঘরের সামনে তার পরিবার-পরিজনের সকল সদস্যের নামের একটা তালিকা করে লটকিয়ে রাখে। এই তালিকা লটকানোর পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, আমেরিকান সেনাদের হাতে উপর্যুপরি ধরষণের শিকার সতেরোজন নারীকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এসব নারীদের সবচেয়ে কমবয়সী ধর্ষিতার বয়স ছিল সাত, আর সবচেয়ে বয়স্ক ধর্ষিতার বয়স ছিল ঊনসত্তর!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যে বিরাট সংখ্যক জার্মানি নারীরা জার্মানের বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য গমন করে। ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, এই পরীক্ষা দিনভর চলতো। নারীরা লাইন ধরে পরীক্ষা করাতো। আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জার্মান সরকার পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত সাইত্রিশ হাজার শিশুর পরিচয় তাদের মায়ের নামেই নিবন্ধিত করেছে! এদের বাপের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি! এমনকি আজও পর্যন্ত প্রায় অর্ধ মিলিয়ন জার্মানি নাগরিকের

কোনো পিতৃপরিচয় পাওয়া যায়নি! শুধুমাত্র জার্মানি নারীদের গণহারে ধর্ষণ করার কারণে!

পশ্চিমা সাদাচামড়ার দুপেয়ে পশুগুলোর এ-এক চেপে রাখা ইতিহাস। এই পশুগুলোই আজকের কথিত সভ্য পৃথিবীতে নারী অধিকারের ফেরিওয়ালা! নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ! নারী স্বাধীনতার ঠিকাদার! নারীমুক্তির অগ্রপথিক! তারা তাদের কালো ইতিহাস লুকিয়ে রাখতে চাইলেও তাদের স্বজাতির কোনো না কোনো নীতিবাদী ঐতিহাসিক এসব কালো ইতিহাসের ভাঁজকরা পাতা উল্টিয়ে দেয়! জেনে ফেলে দুনিয়াবাসী! এই কালো ইতিহাসটাও উন্মোচন করেছেন জার্মানির এক নারী ইতিহাসবেত্তা মরিয়ম গেবহার্ড তার রচিত 'সেনারা যখন এল' বইয়ের পাতায়। তিনিও একজন সাদা চামড়ার দুপেয়ে প্রাণী! অবশ্য পশু নয়!

সূত্র: Miriam Gebhardt: When the Soldiers Came

[সংগৃহীত]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৬৪২

চীন থেকে আগত আল্লাহর বাহিনী!

Saad ibn Muaz
Junior Member
১০-১৩-২০১৮

তুরস্কের 'বার্ক' হুটেলে চিকিতসা চলছে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের। পশ্চিমাদের এই পা-চাটা গোলাম তখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কোনো ধরণের চিকিতসা কাজে আসছে না। ডাক্তাররাও অপারগ হয়ে গেছে। অপারগ না হয়ে উপায় আছে? রোগটাই যেখানে সনাক্ত করা যাচ্ছে না! এ এক অদ্ভুত রোগ! ডাক্তারদের অবস্থা হলো, দুপেয়ে এই পশুটার প্রাণবায়ুটা কোনোরকম বেরিয়ে গেলে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! ওর প্রতিটা মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে হেচকা টান দিয়ে দিয়ে! একবার নিঃশ্বাস ফেলার পর আরেকবার তা নেয়ার আশাই নাই। এরকম একটি নাজুক, ভয়ানক ও ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে হুটেলের নিকটস্থ কোনো একটি ছোট্ট মসজিদের মিনার হতে ভেসে আসল মুয়াজ্জিনের আজান। মরা লাশের মতো পড়ে থাকা এই অভিশপ্তটা একটু সচকিত হয়ে উঠল! কান খাড়া করে শুনতে চাইল- এটা কিসের আওয়াজ! যখন বুঝতে পারল- এটা মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আজানের ধ্বনি, তখন আশেপাশের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখো! এই লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কীভাবে তাঁর নাম ও প্রসিদ্ধিকে চির ওমর করে রেখে গেছে! প্রতিটা মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে তাঁর নাম বারবার উচ্ছারিত হচ্ছে!' এরপর সে মিনারটা গুঁড়িয়ে দেয়ার আদেশ জারি করে!

মৃত্যুর দোড়গড়ায় পৌঁছেও যে অভিশপ্ত এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলত, সে ছিল খুবই ভীতু! মৃত্যুকে বড় ভয় করত! নিজ পরিণতি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকত! তার চারপাশে সার্বক্ষণিক বড় বড় অভিজ্ঞ চিকিতসকদের জটলা বাঁধিয়ে রাখত। এত আয়োজনের পরও সে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। **আল্লাহ তা'আলা অদ্ভুত এক রোগ দিয়ে অভিশপ্তটাকে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করেছেন। লিভারে আক্রান্ত রোগের কারণে তার পেট থেকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সব পানি বের করতে হয়েছিল। অতিরিক্ত নারীমিলনের কারণে খবিসটা সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল!**

শুধু কি তাই?! **মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে সারা শরীরজুড়ে একপ্রকার অদৃশ্য পোকার আক্রমণে অস্থির হয়ে পড়েছিল। চুলকানিতে তার গোটা শরীররের রং বদলে গিয়েছিল। কাপড় খুলে সে প্রায় উলঙ্গ হয়ে থাকত! নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরোত! দেহের চামড়া একেবারে বেঙের খোলসের মত হয়ে গিয়েছিল! রক্ত, পুঁজ ও পানি বেরোত সবসময়। নাক চেপে ধরেও দুর্গন্ধ সহ্য করা যেত না! চিকিতসা করার সময় ডাক্তারদের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম হত! তবুও তাদের চিকিতসা করতেই হত। আধুনিক কুফরি তুরস্কের জনকের চিকিতসা বলে কথা! যন্ত্রণার তীব্রতায় বুভুক্ষু কুকুরের ন্যায় ঘেউঘেউ করত! শেষ পর্যন্ত এ রোগ তার চেহারায়ও ছড়িয়ে পড়ে। পরে দেখা যায়, একধরণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লাল পিঁপড়ে তাকে কামড়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। যে পিঁপড়েগুলোর আসল আবাস সুদূর চীনের বন-জঙ্গলে।**

প্রায় দু'বছর অসহনীয় যন্ত্রণায় ভোগে জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় ঘেউঘেউ করে ১৩৫৮ হিজরির ১৬ই শাবান মুতাবিক ১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর অভিশপ্তটা দুনিয়ায় তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তার জানাযার নামাজ নিয়ে বিভক্তি দেখা দেয়। ততকালীন প্রধানমন্ত্রী জানাযার বিপক্ষে এবং সেনাপ্রধান জানাযার পক্ষে অবস্থান নেন। অবশেষে শরফুদ্দিন আফেন্দি নামের এমন এক সরকারি ভাড়াটে মোল্লা তার জানাযার নামাজ পড়ায়, যে নিজেও ছিল নিন্দিত এবং ঘৃণিত! অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, মৃত্যুর পর তুরস্কের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মুস্তফা কামাল পাশা যাকে মনোনীত করে রেখেছিল, সে হল ততকালে তুরস্কে নিযুক্ত ইংল্যান্ডের দূত। এভাবেই দুনিয়াবাসীকে প্রমাণ করিয়ে দিয়ে যায় যে, জীবনভর সে ছিল পশ্চিমাদের এক পোষা কুকুর।

সুবহানাল্লাহ! তুরস্কের মাটি থেকে আল্লাহর নাম মিটিয়ে ফেলা এই আল্লাহদ্রোহীকে আল্লাহ তা'আলা সুদূর চীনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালপিঁপড়ে দিয়ে শায়েস্তা করলেন! তিনি কতইনা ক্ষমতাবান! আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত-৩১)

সূত্র: ড. রাগিব সিরজানি পরিচালিত জনপ্রিয় সাইট "কিসসসাতুল ইসলাম" কর্তৃক ০৫/১১/২০১৩ তারিখে 'মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক' শিরোনামে প্রকাশিত আর্টিকেল অবলম্বনে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১৭৯

মেথর শুঁকতে পারে না আতরের ঘ্রাণ!

Saad ibn Muaz
Junior Member
১০-১৪-২০১৮

ইউরোপিয়ানদের শরীরের দুর্গন্ধ এতোটাই প্রকট ছিল যে, তা সহ্য করা মুশকিল ছিল! সহ্য করা কীভাবে সম্ভব? **ইউরোপিয়ানরা যে গোসল কী জিনিস- তা আদৌ জানত না! এজন্যই ইউরোপিয়ান যোদ্ধাদের নাকে রেড ইন্ডিয়ানরা গোলাপফুল শুঁকাতো। কারণ, তারা জানত যে, ইউরোপিয়ান যোদ্ধারা গোলাপের সুগন্ধি সহ্য করতে পারে না! কথায় আছে না, মেথর শুঁকতে পারে না আতরের ঘ্রাণ?!** ইউরোপিয়ান ইতিহাসবেত্তা 'সেন্ডর মারাই' বলেন, **ইউরোপিয়ান বারজিউসরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও জীবনে মাত্র দুইবার গোসল করতো। অসুস্থতার সময়ে ও বিয়ের সময়ে!**

ইউরোপে গোসলখানা নির্মাণ আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল! স্পেনসম্রাট 'দ্বিতীয় ফিলিপ' তার রাজ্যে গোসলখানা নির্মাণের নিষেধ জারি করেছিলেন! স্পেন সম্রাজ্ঞী '১ম ঈসাবেলা' গ্রানাডা দখলের পর যেসব আইন জারি করেছিলেন, **তন্মধ্যে একটি আইন ছিল- আন্দালুসীয় মুসলমানদের সবগুলো গোসলখানা ভেঙ্গে ফেলা!** কারণ, তিনি নিজেও গোসল করতেন না! মুসলমানরা গোসল করে ঝকঝকে থাকবে- সেটা তার কাছে একদম অসহ্য লাগত!

আমেরিকান রাইটার 'জুসেফ ম্যাক ক্যাপ' বলেন, **স্পেন সম্রাজ্ঞী '১ম ঈসাবেলা' জীবনে মাত্র দুইবার গোসল করেছেন। তার জন্মের দিনে ও মরণের দিনে!** আল্লামা তাকিউদ্দিন আল-হিলালি আল-মাগরিবি বলেন, প্রকৃতার্থে রাণী ঈসাবেলা তার জীবনে মাত্র একবার গোসল করেছেন! আর তা তার বিয়ের রাতে! জন্ম ও মরণের দিনের গোসল ঈসাবেলার ব্যক্তিগত কোনো কাজ ছিল না! রাজা ফিলিপের কন্যা '২য় ঈসাবেলা' কসম করেছিলেন যে, অমুক দূর্গ বিজয় করা ব্যতিত তার দেহের পরিধেয় বস্ত্র খুলবেন না। এই অবস্থায়ই তিন বছর পেরিয়ে যায়। দেহের নাজুক অবস্থার কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত মারা যান!

ফরাসী ইতিহাসবেত্তা 'জর্জ ফেগারেল' বলেছেন, **ফ্রান্স সম্রাট 'চৌদ্দতম লুইস' জীবনে মাত্র ৩ বার গোসল করেছে!** রূশ প্রতিনিধি লুইসের ব্যাপারে বলেছেন,

লুইসের দেহের দুর্গন্ধ ভূচর প্রাণীর দুর্গন্ধের চেয়েও ছিল অসহ্যকর! লুইসের এক দাসী ছিল, 'ডি ম্যান্টিসবাম' নামে। সে আতরের হাউজে গোসল করে দেহকে সুগন্ধিত করত; যাতে করে লুইসের দুর্গন্ধ না শুঁকতে পারে!

তিনি আরও বলেন, এই লুইসের হেরেমের রমণীগণ তাদের দেহ ও দেহের পবিত্রতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যত্নবান ছিল। তারা বছরে মাত্র ২ বার গোসল করত!

ফ্রান্সের বর্তমান বিখ্যাত পারফিউম আবিষ্কারই হয়েছিল ফরাসীদের দেহের দুর্গন্ধ দূরীভূত করার জন্য!

ইউরোপীরা সভ্যতা শিখলে মুসলিমদের থেকেই শিখেছে। এটা তাদের ঘরানার ব্যক্তিরাই অকপটে স্বীকার করেছে। **প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক 'ড্রেভার' বলেন, আমরা ইউরোপিয়ানরা সভ্য হয়েছি আরবদের (মুসলিমদের) মাধ্যমেই। মুসলিমরা আমাদেরকে শিখিয়েছে- কীভাবে দেহের যত্ন নিতে হয়। কেননা মুসলিমরা ইউরোপীদের বিপরীত ছিল।** ইউরোপীরা তাদের দেহের বস্ত্র ততক্ষণ পর্যন্ত খুলত না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ময়লাযুক্ত হত না এবং মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়াত না! দেহের বসন খোলা ও ধৌত করার ক্ষেত্রে আমরা মুসলিমদেরই অনুসরণ করেছি। মুসলিমরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতো। এমনকি তারা কাপড়কে বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান পাথর, যেমন: যুমরূদ, ইয়াকূত ও মারজান দ্বারা সজ্জিত করত!

ড্রেভার আরও বলেন, তখন কর্ডোভায় প্রায় তিনশ গোসলখানা পর্যাপ্ত ছিল, যখন ইউরোপের গীর্জাগুলো গোসলখানাকে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখত!

অনুভূতি: নিকট অতীতের বুনো এই দুপেয়ে প্রাণীগুলোই নাকি আজকের পৃথিবীতে সভ্যতার ফেরিওয়ালা! হায় অতীত! তুমি এতো ঘোমটা পরা কেন?!

সূত্র: وثائق رسمية من أسبانية و مذكرات الكاتب ساندورماراي

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১৯৪

*****